অণুজীব

সূচীপত্র

Basic

CQ Analysis

APAR'S
SINCE 2018

যে টপিকে যেতে চান সে টপিকে Click করুন

অণুজীব

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) এর সাহায্যে যে 'জীব' কে দেখতে হয়, সেই ক্ষুদ্র জীব দের অণুজীব বলে।

অণুজীব

- ভাইরাস
- ব্যাক্টেরিয়া
- ম্যালেরিয়া পরজীবী
- আর্কিয়া
- মাইকোপ্লাজমা
- অ্যাকটিনোমাইসিটিস

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাস

ভাইরাস অকোষীয়। অর্থাৎ এতে কোন কোষ নেই। শুধুমাত্র নিউক্লিক এসিড (DNA অথবা RNA-এর একটি) এবং প্রোটিন দিয়ে ভাইরাস গঠিত।

আবিষ্কার:

নাম	কাহিনি
জেনার	বসন্ত
Mayer	দাগযুক্ত টোবাকো মাওজাইক রোগ
আইভানোভস্কি	ভাইরাস আবিষ্কারক
Stanley(জনক)	TMV কেলাসন
ব্যাডেন+পিরি	Nuclic Acid+Protein
শেফারম্যান,মরিস	সায়ানোব্যাকটেরিয়া
Walter Reed	পীত জ্বর (Yellow Fever)
Gallow	HIV আবিষ্কারক
Harvery J. Alter	হেপাটাইটিস সি
বিজারিঙ্ক	TMV কে TMV নাম
Lwoff	ভাইরাস

Structure of Virus:

DNA/RNA (As genetic metarial)

↓ Double stranded/ Single stranded

↓ Single/ Double stranded

- কোনো Virus এ একইসাথে DNA ও RNA থাকতে পারে না।

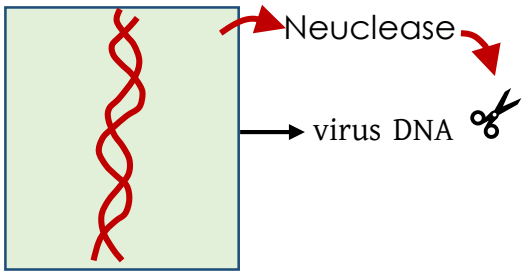

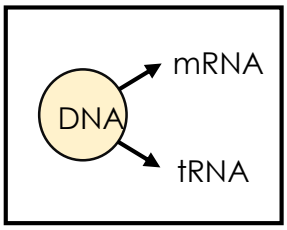

প্রাণীকোষে একই সাথে DNA এবং RNA থাকে

সূচীপত্রে ফেরত

Structure of Virus:

DNA/RNA (As genetic metarial)

↓ **Double stranded/ Single stranded**

↓ **Single/ Double stranded**

- কোনো Virus এ একইসাথে DNA ও RNA থাকতে পারে না।

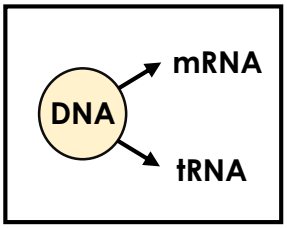

প্রাণীকোষে একই সাথে DNA এবং RNA থাকে

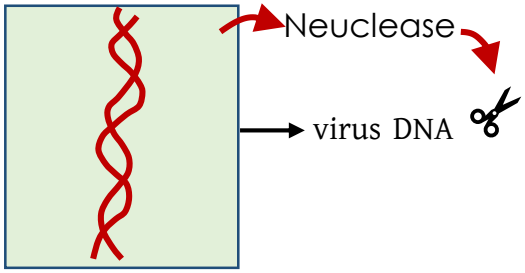

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন:

রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু দিয়ে গঠিত, যথা : নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং প্রোটিন (ক্যাপসিড)।

১। নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) : ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড

২। প্রোটিন (ক্যাপসিড) : প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড ভেতরের বস্তুকে (DNA বা RNA) সুরক্ষা করে এবং এটি অ্যান্টিজেন হিসেবেও কাজ করে।

৩। বহিস্থ আবরণ : কোনো কোনো ভাইরাসে (যেমন-ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, HIV, Corona virus ইত্যাদি) ক্যাপসিডের বাইরে জৈব পদার্থের একটি আবরণ থাকে। এটি রাসায়নিকভাবে সাধারণত লিপিড, লিপোপ্রোটিন, শর্করা বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ দিয়ে গঠিত।

APAR'S SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাসের প্রকারভেদ

নিউক্লিক এসিডের ধরণ অনুযায়ীঃ

- DNA Virus:

টিপুর ভাই টিটু ভ্যানিলা হতে ফ্রান্সে এলো

- টি → TIV
- পু → ভ্যারিওলা
- র → T_2
- ভা → ভ্যাকসিনিয়া
- ই → হার্পিস হেপাটাইটিস-বি
- ফ্রান্সে → ফুলকপির মোজাইক ভাইরাস
- এলো → এডিনো

- RNA Virus:

পোলিও,মাম্পস,র‍্যাবিস,নভেল করোনা

APAR'S
SINCE 2018

পোষক দেহ অনুসারেঃ

১. উদ্ভিদ Virus: TMV,BYV

২. প্রাণী ভাইরাসঃ HIV,ভ্যাক্সিনিয়া,নভেল করোনা ভাইরাস

৩. ফাজ ভাইরাসঃ T_2, T_4, T_6 ব্যাকটেরিয়াওফাজ

৪. সায়ানোফাজঃ Lpp, Lpp_2

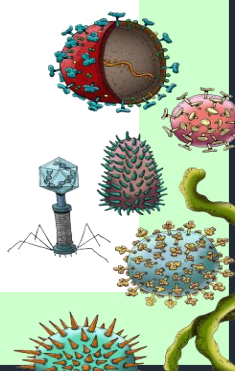

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাসের প্রকারভেদ

আকৃতি অনুযায়ী

- **দন্ডকারঃ**

A T M

- A → সালফা, আলফা মেজাইক ভাইরাস
- T → TMV
- M → মাম্পস ভাইরাস

- **গোলাকারঃ** পোলিও ভাইরাস, TIV,HIV,ডেঙ্গু ভাইরাস

- **ঘনক্ষেত্রাকার/বহুভূজাকার (Cubial) :**

H C V

হার্পিস Cubical ভ্যাকসিনিয়া

- **ব্যাঙ্গাচি আকারঃ** T_2, T_4, T_6

- **সিলিন্ড্রিক্যালঃ** Ebola, মটরের স্ট্রিক ভাইরাস

- **ডিম্বাকারঃ** ইনফ্লুয়েঞ্জা

APAR'S
SINCE 2018

বহিঃস্থ আবরণ অনুযায়ীঃ

- **বহিঃস্থ আবরণহীনঃ** TMV, T_2

- **বহিঃস্থ আবরণযুক্তঃ** ইনফ্লুয়েঞ্জা,হার্পিস,HIV

HIV একটি রিট্রোভাইরাস

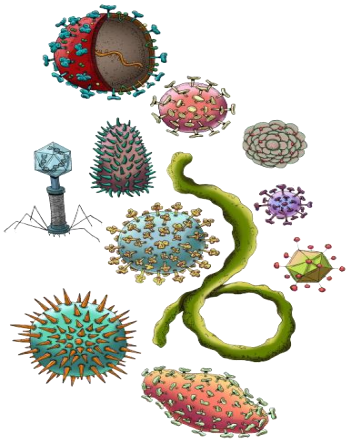

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাস কি জীব না জড়

ভাইরাস জীব এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করে।

ক) ভাইরাসের জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য :

১। ভাইরাস অকোষীয় ও অতি আণুবীক্ষণিক। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লি, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া এসব অঙ্গাণু নেই।

২। এদের নিজস্ব কোনো বিপাকীয় এনজাইম নেই এবং খাদ্য গ্রহণ করে না ফলে পুষ্টি ক্রিয়াও নেই।

৩। ভাইরাস জীবকোষের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে প্রজননক্ষম নয়।

৫। ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায়, তলানিকরণ করা যায়।

৬। জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার মতো নিষ্ক্রিয়।

৮। ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমাহার মাত্র।

খ) ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য :

১। পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি (multiplication) করতে পারে।

২। নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মাতৃ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাসের জন্ম দিতে পারে।

৩। ভাইরাসের দেহ জেনেটিক বস্তু DNA অথবা RNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত।

৪। ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।

৫। ভাইরাস পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে এবং প্রকরণ (variation) তৈরি করতে সক্ষম।

৬। এদের অভিযোজন ক্ষমতা রয়েছে।

৭। এদের জিনগত পুনর্বিন্যাস (genetic recombination) ঘটতে দেখা যায়।

APAR'S SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

কতিপয় ভাইরাসের গঠন

১. টোবাকো মোজাইক ভাইরাস

গঠন:

এটি দণ্ডাকৃতির ভাইরাস। এটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের **প্রায় ১৭ গুণ।** TMV এর দৈর্ঘ্য ২৮০ nm-৩০০ nm এবং প্রস্থ ১৫ nm-১৮ nm। RNA এবং প্রোটিন দিয়ে TMV গঠিত। এর বাইরে **একটি পুরু প্রোটিন আবরণ আছে।** ক্যাপসিড বহু উপ-একক দ্বারা গঠিত। উপ একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে। ক্যাপসোমিয়ার কতগুলো। **আঙ্গুরের থোকার ন্যায় পরপর সজ্জিত থাকে। TMV-তে প্রায় ২১৩০-২২০০টি ক্যাপসোমিয়ার থাকে।** প্রতিটি **ক্যাপসসামিয়ারে ১৫৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। ওজন হিসেবে এর শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগই প্রোটিন।** TMV এর আণবিক ওজন ৩৭ মিলিয়ন ডাল্টন এবং RNA এর আণবিক ওজন ২.৪ মিলিয়ন ডাল্টন। প্রত্যেকটি প্রোটিন সাবইউনিটের আণবিক ওজন ১৭০০০ ডাল্টন।

APAR'S
SINCE 2018

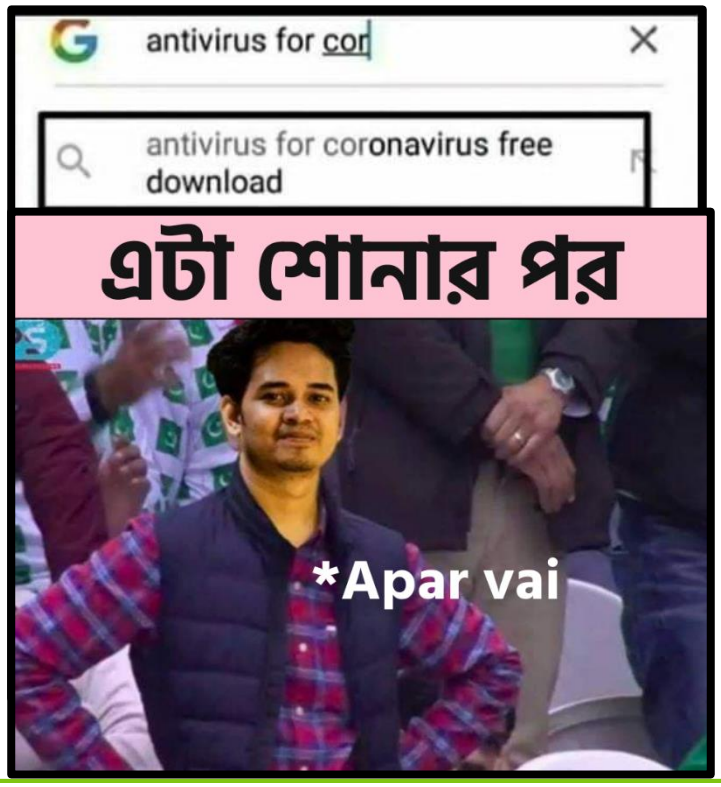

সূচীপত্রে ফেরত

কতিপয় ভাইরাসের গঠন

২। T_2 ব্যাকটেরিওফায

গঠন: এটি একটি সর্বাধিক পরিচিত ভাইরাস। দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা চলে, যথা : মাথা এবং লেজ।

মাথা :

মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভুজাকৃতির প্রিজমের ন্যায় এবং প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০nm এবং প্রস্থ ৬৫nm। থলি আকৃতির এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির দ্বি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিয়োটাইড দিয়ে এই DNA গঠিত। এতে প্রায় ১৫০টি জিন থাকে।

লেজ : মাথার পেছনে সরু অংশটির নাম লেজ। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm । এর অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে ১টি বেসপ্লেট, কাঁটার মতো কয়েকটি স্পাইক এবং ছয়টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি।

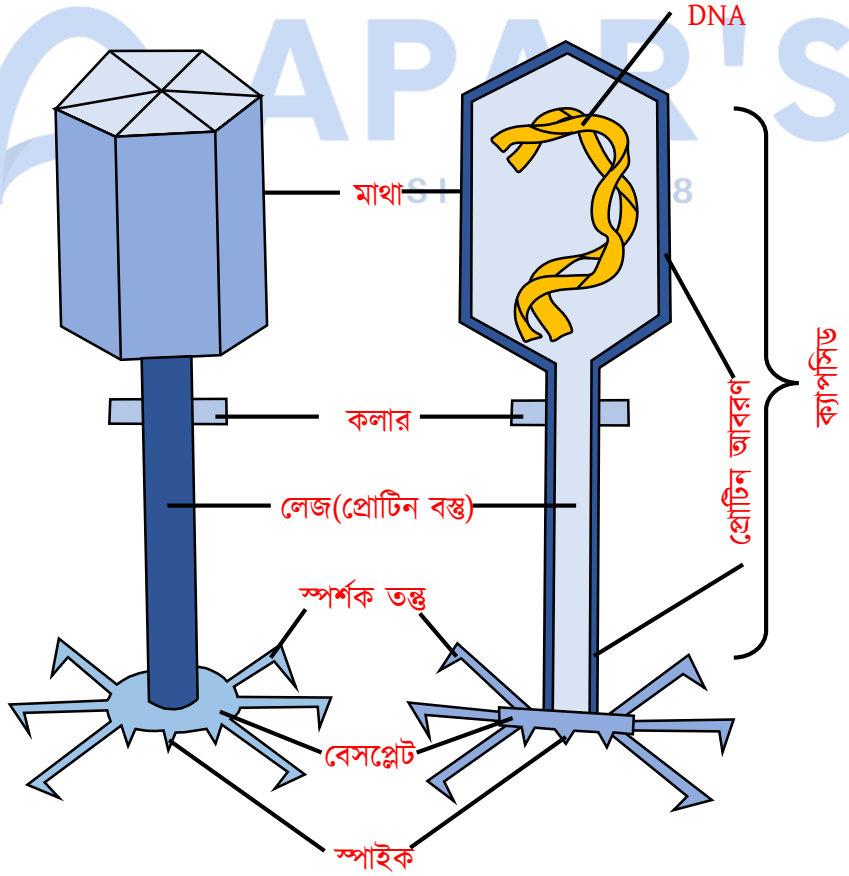

T_2 ব্যাকটেরিওফাযের গঠনঃ (ক) পূর্ণাঙ্গ গঠন, (খ) লম্বচ্ছেদ

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি:

ভাইরাসের যেহেতু কোষ নেই, তাই এর দৈহিক বৃদ্ধি হয় না। ভাইরাসের গাঠনিক উপাদান গুলো তৈরি হয়। পরে সেসব একত্রিত হয়ে নতুন ভাইরাস তৈরি হয়।

ব্যাকটেরিওফাজ – এর সংখ্যাবৃদ্ধি দুইভাবে ঘটে থাকে। যথা-

১. লাইটিক চক্র

২. লাইসোজেনিক চক্র

লাইটিক চক্র

যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং অপত্য ভাইরাসগুলো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তাকে লাইটিক চক্র বা বিগলনকারী চক্র বলে।

ধাপ-১: সংযুক্তি বা পৃষ্ঠলগ্নীভবন (Attachment/ Landing) :

ধাপ-২: ফায DNA অণু প্রবেশ (Penetration) :

ধাপ-৩: অনুলিপন (Replication) :

ধাপ-৪: বিভিন্ন দেহাংশ একত্রিত হওয়া (Assemble) :

ধাপ-৫: নতুন ভাইরাস মুক্তি (Release) :

APAR'S SINCE 2018

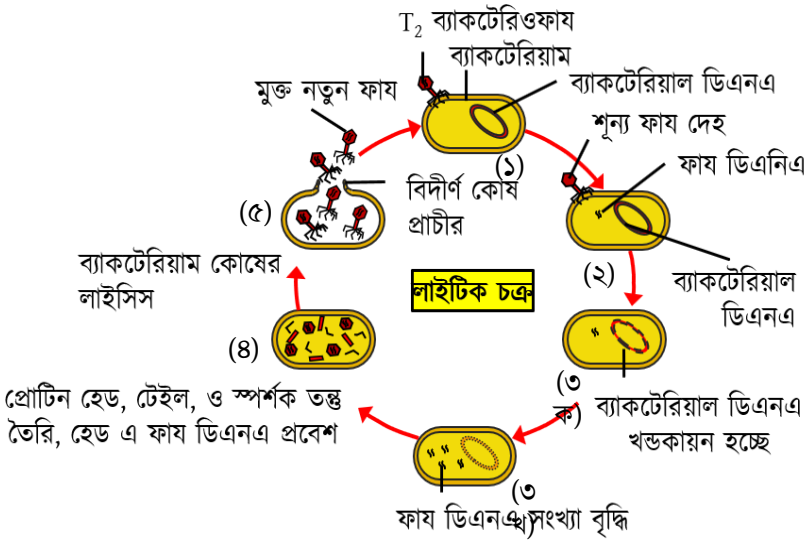

চিত্রঃ T_2 ব্যাকটেরিওফায-এর লাইটিক চক্র

সূচীপত্রে ফেরত

লাইসোজেনিক চক্র

যে প্রক্রিয়ায় ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNA-টি ব্যাক্টেরিয়ার DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং ব্যাকটেরিয়াল DNA-র সঙ্গে একত্রিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ বা লাইসিস ঘটিয়ে মুক্ত হয় না তাকে লাইসোজেনিক চক্র বলে।

১। পোষক ব্যাকটেরিয়ায় সংযুক্তি এবং ফায DNA-এর অনুপ্রবেশ :

লাইটিক চক্রের মতোই প্রথমে ফায ভাইরাস পোষক কোষপ্রাচীরকে ছিদ্র করে DNA অণুকে পোষক কোষে প্রবিষ্ট করায় এবং শূন্য প্রোটিন আবরণটি পোষক কোষের বাইরে থেকে যায়।

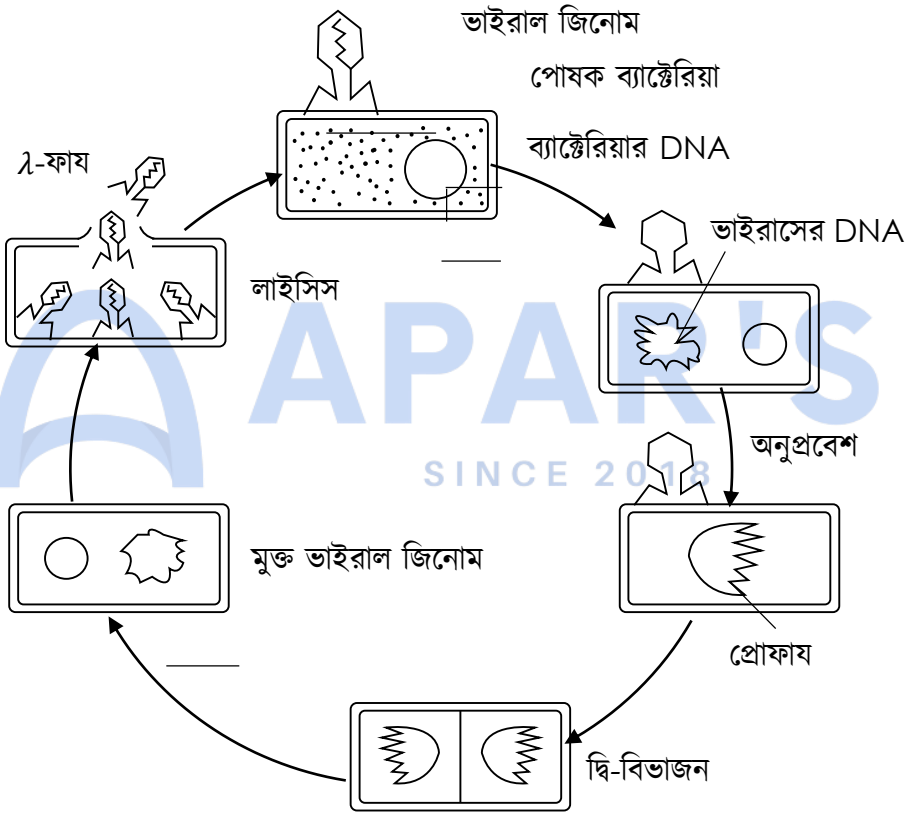

চিত্রঃ লাইসোজেনিক চক্র

২। ব্যাকটেরিয়া DNA এর সঙ্গে ভাইরাস DNA এর সংযুক্তি :

এ পর্যায়ে **নিউক্লিয়েজ** এনজাইম ব্যাকটেরিয়ার DNA-কে একটি জায়গায় কেটে ফেলে। এই কাটা স্থানে ফায DNA-টি গিয়ে সংযুক্ত হয়। এ ধরনের সংযুক্তিতে **ইন্টিগ্রেজ** এনজাইম বিশেষ ভূমিকা রাখে।

সূচীপত্রে ফেরত

লাইটিক ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
১। গঠনগত	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটিয়ে থাকে।	এ চক্রে ফায ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অনুটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অনুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে অনুলিপি গঠন করে।
২। বিদারণ	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষকে বিদারিত করে মুক্ত হয়।	পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্ত হয় না।
৩। বিভিন্ন সিরিজ	T-সিরিজযুক্ত ফাযে লাইটিক চক্র দেখা যায়।	λ (ল্যামডা)- সিরিজযুক্ত ফাযে লাইসোজেনিক চক্র দেখা যায়।
৪। সৃষ্টি	লাইটিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়।	লাইসোজেনিক চক্র একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জিনোমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।
৫। নিয়ন্ত্রণ	এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।	এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি পোষক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৬। প্রোফায গঠন	গঠিত হয় না।	গঠিত হয়।
৭। আক্রমণের তীব্রতা	আক্রমণের প্রকৃতি তীব্র বা ভিরুলেন্ট।	পোষক কোষের মৃত্যু ঘটে না তাই আক্রমণ মৃদু বা টেম্পরেট।

ইমার্জিং ভাইরাস : প্রথমে এক ধরনের পোষক দেহে রোগ সৃষ্টি করে, পরবর্তীতে নতুন পোষকে রোগ সৃষ্টি করার সক্ষমতা অর্জন করে এবং রোগ সৃষ্টি করে । যেমন- HIV ভাইরাস প্রথমে শুধু বানরে রোগ সৃষ্টি করতো। পরবর্তীতে বিবর্তিত হয়ে মানুষে রোগ সৃষ্টি করছে।

ভিরিয়ন : নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে **ভিরিয়ন** বলে। সংক্রমণ ক্ষমতাবিহীন ভাইরাসকে বলা হয় **নিউক্লিয়োক্যাপসিড**।

ভিরয়েডস : ভিরয়েডস হলো সংক্রামক RNA। Theodore Diener (US এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট) এবং W.S. Rayner ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভিরয়েডস আবিষ্কার করেন। **ভিরয়েডস হলো এক সূত্রক বৃত্তাকার RNA অণু যা কয়েক শত নিউক্লিয়োটাইড নিয়ে গঠিত এবং ক্ষুদ্রতম ভাইরাস থেকেও বহুগুণে ক্ষুদ্র।** কেবলমাত্র উদ্ভিদেই ভিরয়েডস পাওয়া যায়। ভিরয়েড নারিকেল গাছে **ক্যাডাং রোগ** তৈরি করে।

সূচীপত্রে ফেরত

লাইটিক ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য

প্রিয়নস : সংক্রামক প্রোটিন ফাইব্রিল হলো প্রিয়নস। এটি নিউক্লিক অ্যাসিডবিহীন প্রোটিন আবরণ মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের *Kuru* এবং *Creutzfeldt* রোগ; ভেড়া ও ছাগলের *Scrapie* রোগ প্রিয়নস দিয়ে হয়ে থাকে। বহুল আলোচিত **'ম্যাড কাউ'** রোগ সৃষ্টির সাথে প্রিয়নস-এর সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।

ভাইরাসের উপকারিতা ও অপকারিতা

অপকারিতা :

১। ভাইরাস মানবদেহে বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস, ক্যাপোসি সার্কোমা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

২। শিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কুঁচকাইয়া যাওয়া), পেঁপের লিফকার্ল, ক্লোরোসিস, ধানের টুংরো রোগসহ **প্রায় ৩০০ উদ্ভিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে।**

৩। **'ফুট এ্যান্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।**

APARS SINCE 2018

৪। **ফায ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও ধ্বংস করে থাকে।**

৫। **HIV ভাইরাস দিয়ে AIDS হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।**

৬। **Ebola ভাইরাসের আক্রমণে cell lysis হয় বা কোষ ফেটে যায়।**

৭। **Zika ভাইরাস মশকীর মাধ্যমে ছড়ায়।**

৮। **নিপা ভাইরাস Paramyxoviridae পরিবারভুক্ত একটি RNA ভাইরাস যার** আক্রমণে শ্বসন জটিলতায় মানুষসহ গৃহপালিত পশুপাখির মৃত্যু ঘটে।

৯। **সম্প্রতি SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ভাইরাসের কারণে চীন, তাইওয়ান, কানাডা প্রভৃতি দেশে বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। MERS (Middle East Respiratory Syndrome) ভাইরাসও একটি মারাত্মক ভাইরাস।**

১০। বার্ড ফ্লু-একটি ভাইরাসজনিত রোগ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছরই হাজার হাজার মুরগি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। **অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H_5N_1 (Hemaglutinin types-5-Neuraminidase type-1) ভাইরাসের আক্রমণে হাঁস-মুরগিতে বার্ড ফ্লু নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয় যা পোল্ট্রি শিল্পকে ধ্বংস করে।**

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাসের উপকারিতা ও অপকারিতা

১১। সোয়াইন ফ্লু- Swine Influenza virus (SIV) দ্বারা সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে সোয়াইন ফ্লু শনাক্ত করা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের Subtype H_5N_1 ও H_1N_1 (Hemaglutinin type-1-Neuraminidase type-1) এর কারণে এই ফ্লু ঘটে থাকে। এ ভাইরাস দ্বারা মানুষ ও শূকর আক্রান্ত হয়।

১২। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস দিয়ে মানুষের লিভার ক্যান্সার, পেপিলোমা ভাইরাস দিয়ে এনোজেনিটাল জরায়ুর মুখে ক্যান্সার, হার্পিস সিমপ্লেক্স দিয়ে ক্যাপোসি সার্কোমা ইত্যাদি মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

১৩। মানুষের অসুস্থ হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হলো সর্দিজ্বর (common cold)। বিভিন্ন প্রকৃতির অনেকগুলো ভাইরাস এর জন্য দায়ী; তাই এর জন্য কোনো ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

১৪। চিকুনগুনিয়া ভাইরাস এর আক্রমণে উচ্চজ্বর, জয়েন্টে ব্যাথা, শরীরে র‍্যাশ ওঠা, মাথা ব্যাথা, দূর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এটি RNA ভাইরাস জনিত জ্বর।

APAR'S
SINCE 2018

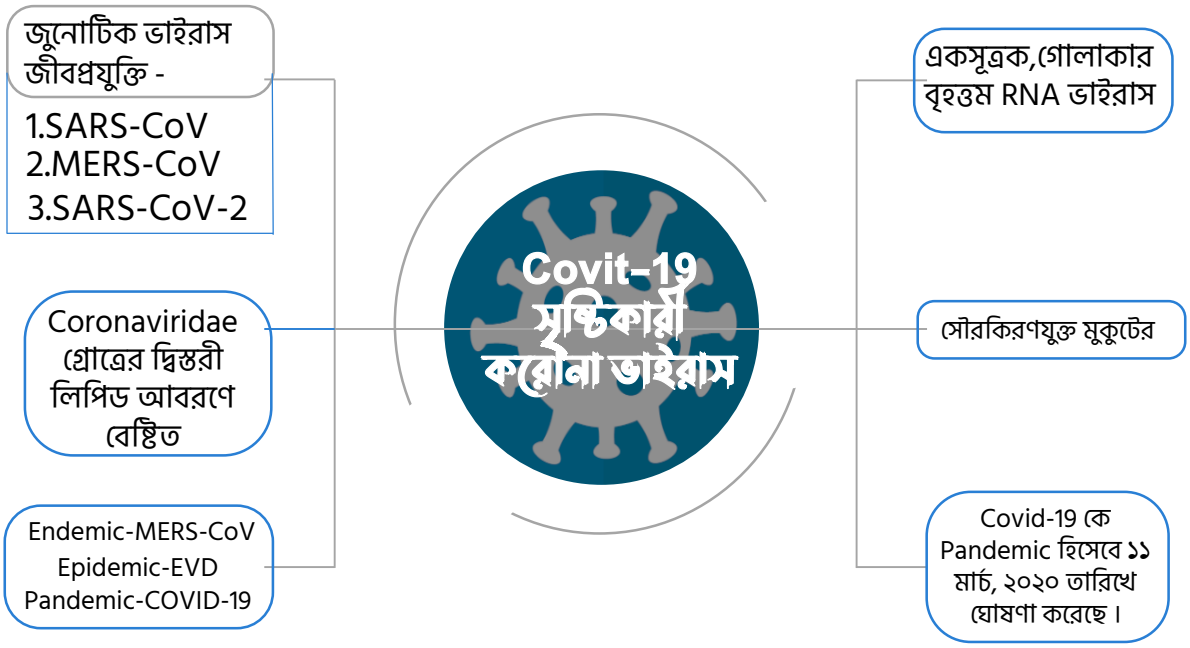

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাসের উপকারিতা

১. **বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।**

২. **ভাইরাস হতে 'জন্ডিস' রোগের টিকা তৈরি করা হয়।**

৩. কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৪. **ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত 'জেনেটিক প্রকৌশল'-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।**

৫. ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।

৬. কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। **যুক্তরাষ্ট্রে NPV (Nuclear polyhydrosis Virus) কে কীট পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।**

৭. অস্ট্রেলিয়ার খরগোশের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছিল। **Myxovirus-এর সাহায্যে খরগোশ নিধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।**

APAR'S
SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

কয়েকটি প্রাণী ভাইরাস রোগের নাম, পোষকদেহ এবং ভাইরাসের নাম

সৃষ্ট রোগের নাম	পোষকদেহ	ভাইরাসের নাম
তামাকের মোজাইক রোগ	তামাক	Tobacco Mosaic virus
শিমের মোজাইক রোগ	শিম	Bean Mosaic virus
ধানের টুংরো রোগ	ধান	Tungro virus
AIDS	মানুষ	HIV ভাইরাস
ডেঙ্গু/ ডেঙ্গী জ্বর	মানুষ	ফ্ল্যাভি ভাইরাস (Flavi virus)
বার্ড ফ্লু	হাঁস-মুরগি, পাখি	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_5N_1) ভাইরাস
চিকুনগুনিয়া	মানুষ	চিকুনগুনিয়া ভাইরাস
Swine flu	মানুষ, শূকর	ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_5N_1) & ভাইরাস(H_1N_1) ভাইরাস
SARS	মানুষ	Nipah virus
জলাতঙ্ক	মানুষ	র‍্যাবিস ভাইরাস (Rabis virus)
গুটি বসন্ত (small pox)	মানুষ	ভেরিওলা ভাইরাস (Variola virus)
জলবসন্ত (chicken pox)	মানুষ, পশুপাখি	Varicella-Zoster virus
ভাইরাল নিউমোনিয়া	মানুষ	Adeno virus
কোষের লাইসিস (lysis)	মানুষ	Ebola virus
সাধারণ সর্দি	মানুষ	Rhino virus
হাম	মানুষ	রুবিওলা ভাইরাস (Rubeola virus)
পোলিওমাইলাইটিস	মানুষ	পোলিও ভাইরাস (Polio virus)
ইনফ্লুয়েঞ্জা	মানুষ	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (Influenza virus)
হার্পিস	মানুষ	হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus)
জন্ডিস/লিভার ক্যান্সার	মানুষ	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B)
গো-বসন্ত	গরু	ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস (Vaccinia virus)
পা ও মুখের ক্ষত	গরু/ভেড়া/মহিষ	'ফুট অ্যান্ড মাউথ' ভাইরাস
ইঁদুরের টিউমার	ইঁদুর	পলিওমা ভাইরাস (Polioma virus)

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাস ঘটিত কিছু রোগ, লক্ষন ও প্রতিকার

ভাইরাস ঘটিত রোগসমূহ (Viral diseases) :

(ক) ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis)

ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বা সংক্ষেপে হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩% এবং বাংলাদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারে স্থায়ী আক্রমণ গড়ে তোলে, যা ১০-১৫ বছরের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়।

রোগের কারণ :

হেপাটাইটিস রোগের কারণ হেপাটাইটিস-B ভাইরাস (HBV)। এছাড়া হেপাটাইটিস-A ভাইরাস (HAV); হেপাটাইটিস-C ভাইরাস (HCV) যাকে বলা হয় **'তুষের আগুন'** (নিরব ঘাতক এবং আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসার অভাবে অধিকাংশ সময় মারা যায়; হেপাটাইটিস-D ভাইরাস (HDV) ও হেপাটাইটিস-E ভাইরাস (HEV) দিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। হেপাটাইটিস-C অবশ্য হেপাটাইটিস-B অপেক্ষা অধিক মারাত্মক।

- আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
- অনিরাপদে যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

APAR'S SINCE 2018

বৈশিষ্ট্য	HAV	HBV	HCV	HDV	HEV
ভাইরাসের গ্রুপ	এন্টারো ভাইরাস	হেপাডিএন এ ভাইরাস	ফ্ল্যাভি ভাইরাস	অসম্পূর্ণ ভাইরাস	ক্যালিসি ভাইরাস
নিউক্লিক এসিড	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA
আয়তন	২৭nm	৪২nm	৩০-৩৮nm	৩৫nm	২৭nm
সুপ্তিকাল	১৪-২৮ দিন	৪৫-১৮০ দিন	১৪-১৮০ দিন	২১-৪৯ দিন	২১-৫৬ দিন

সূচীপত্রে ফেরত

(ক) ভাইরাল হেপাটাইটিস (Viral Hepatitis)

রোগের লক্ষণ :

রক্তের মাধ্যমে এই রোগ দেহে প্রবেশ করে এবং লিভারে নীত হয় ও লিভারকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাস কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড (সুপ্তিকাল) ৪৫-১৮০ দিন। ক্রমশ জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি, বমি বমি ভাব, দুর্বল বোধ, পাতলা পায়খানা, হাড়ের গিটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে প্রস্রাব হলুদ হয়, চোখের সাদা অংশ এবং সমস্ত শরীর হলদ বর্ণ দেখায়, পেটে ও পায়ে পানি জমা হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি সবসময় অস্বস্তি অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস B ও C ভাইরাসের সংক্রমণে হয়ে থাকে। **রক্তে বিলিরুবিনের এবং SGPT এর মাত্রা বৃদ্ধি। এ দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। হেপাটাইটিস B নির্ণয়ের জন্য রক্তের এইচবি সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পরীক্ষা করতে হয়।**

নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার :

রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া দরকার। সাধারণত এর কোনো কার্যকরী চিকিৎসা নেই। নিয়মিত চিকিৎসায় সুস্থ থাকা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া যায় না। এর মূল চিকিৎসা হলো রোগীকে ১০-১২ দিন পূর্ণ বিশ্রামে রাখা। গ্লুকোজের সরবত খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। অড়হড় পাতা, ভুঁই আমলার পাতা ইত্যাদির রস খাওয়ায়ে উপকার পেয়েছেন বলেও অনেকে দাবি করেছেন। **Amoxicillin, Metronidazole, ভিটামিন-সি প্রভৃতি ওষুধ খাওয়াতে হবে।**

APARS SINCE 2018

প্রতিরোধ :

প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো **প্যান্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন** গ্রহণ করা। হেপাটাইটিস-B-এর ভ্যাকসিন ডোজ ৪টি। প্রথম ৩টি একমাস পরপর এবং ৪র্থ টি প্রথম ডোজ থেকে এক বছর পর। পাঁচ বছর পর বুস্টার ডোজ নিতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরে হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের বিপক্ষে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। রক্ত পরীক্ষা করে এইচবি - সারফেস অ্যান্টিজেন (HBsAg) পজিটিভ হলে B-ভাইরাস আক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয় এবং তাকে ভ্যাকসিন দেয়া যায় না। মা থেকে শিশুতে এই রোগ ছড়াতে পারে, তাই সাবধান হতে হবে। রক্ত দেওয়া-নেওয়ায় সাবধান হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে ডিসপোজিবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা। সেলুনে সেভ করা পরিহার করতে হবে। প্রতিজনের জন্য আলাদা আলাদা ব্লেড ব্যবহার করা উচিত। ব্যক্তিগত টয়লেট্রিজ দ্রব্য যেমন টুথব্রাশ, রেজার, নেইল কাটার ও রক্ত গ্রহণের যন্ত্রপাতি অন্য কেউ ব্যবহার না করা।

সূচীপত্রে ফেরত

(খ) ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

রোগের কারণ:

ডেঙ্গু (প্রকৃত উচ্চারণ ডেঙ্গী) একটি ভাইরাসঘটিত রোগ। এই ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্ল্যাভিভাইরাস/ডেঙ্গী ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti L.* ও *Aedes albopictus* মশকী (স্ত্রী মশা) আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ।

রোগের লক্ষণ :

i) সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর :

প্রথমে শীত শীত ভাব হয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর দেখা দেয়। জ্বর **১০৩-১০৫** (ডিগ্রি) ফারেনহাইট হয়ে থাকে। সাধারণত স্ত্রী ডেঙ্গু মশা কামড়ানোর ২-৭ দিন পর জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর তীব্র মাথা ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেট ব্যথা, কপাল ব্যথা ও গলা ব্যথা হয়। রোগীর সমস্ত শরীরে (মাংসপেশি , পিঠ, কোমর, ঘাড়, হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়) ব্যথা হয়। **মেরুদণ্ডের ব্যথাসহ কোমরে ব্যথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। একে হাড়ভাঙ্গা জ্বর বলে।** শরীরে লালচে রঙের র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) দেখা দিতে পারে। বমি বমি ভাব ও খাবারে অরুচি হতে পারে। মারাত্মক পর্যায়ে পৌছালে রক্তক্ষরণ (bleeding) হয়।

ii) হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর :

সাধারণ ডেঙ্গু জ্বরে জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখের কোণে রক্ত জমাট হতে পারে। রক্তে **প্লেটিলেট (অণুচক্রিকা)** ভীষণ, হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু ঘটতে পারে।

(iii) ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম :

হেমোকনসেনট্রেশন ঘটতে দেখা যায়। তিন ধরনের ডেঙ্গু জ্বরের মধ্যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম অত্যন্ত মারাত্মক।

রোগ নির্ণয় :

সেরোলজি : রক্ত পরীক্ষায় IgG অ্যান্টিবডি উপস্থিত থাকতে পারে অথবা তীব্র সংক্রামিত রক্তে অ্যান্টিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

প্লেটিলেট পরীক্ষা : রক্তের অনুচক্রিকার সংখ্যা ১৫০০০০/mm এর অনেক নিচে নেমে আসে।

সেল কালচার: রক্ত কণিকা কালচার করেও ভাইরাস শনাক্ত করা যায়।

APAR'S SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

(খ) ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

প্রতিকার/চিকিৎসা :

ডেঙ্গু জ্বরে রোগীকে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দিলে মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে, তাই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবেনা। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেয়া, ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পঞ্জ করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়। দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের অবশ্যই মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া গর্ভবতী মায়েদের ডেঙ্গু হলে অন্যান্য রোগীর মতোই যত্ন নিতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

প্রতিরোধ :

ডেঙ্গু মশা নিধন করাই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এই মশা দিনের বেলায় কামড়ায়, কাজেই দিনের বেলায় মশার কামড় থেকে বাঁচতে হবে। রোগ প্রতিরোধে দিনের বেলায় মশারী টানিয়ে ঘুমানো, মশার কয়েল অথবা ইলেকট্রিক ভ্যাপার ম্যাট ব্যবহার করতে হবে, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। এই মশা ময়লা পানিতে জন্মায় না, বাড়ির আশপাশে বিভিন্ন কনটেইনারে (ফুলের টব, ভাঙ্গা হাড়ি পাতিল, ডাবের খোসা, ড্রাম ইত্যাদি) রক্ষিত বা সঞ্চিত পরিষ্কার পানিতে জন্মায়, তাই পানির এসব উৎস ধ্বংস করতে হবে অর্থাৎ পানি জমতে না দেয়া। পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনের জন্য নিয়মিত পতঙ্গনাশক স্প্রে করে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডাতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তিতে পতঙ্গনাশক ছাড়াই ডেঙ্গু মশা নিধনের ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে।

APARS SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

(গ) পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ

পেঁপের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ হলো ভাইরাসঘটিত রিংস্পট রোগ। বাংলাদেশসহ ভারত, চীন, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, হাওয়াই ও টেক্সাসসহ বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে পেঁপে গাছে এ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয়। উদ্ভিদ **রোগতত্ত্ববিদ জেনসন ১৯৪৯ সালে** এ রোগের নামকরণ করেন রিংস্পট (Ringspot)।

রোগের কারণ : একটি ভাইরাস দ্বারা পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়। ভাইরাসটি সাধারণভাবে Papaya ringspot virus বা PRSV নামে পরিচিত। এর গণ Potyvirus, গোত্র Potyviridae. PRSV কতকটা দণ্ডাকৃতির, এটি ৭৬০-৮০০ nm লম্বা এবং এর ব্যাস ১২ nm। পেঁপে ছাড়াও এ ভাইরাস কুমড়া জাতীয় উদ্ভিদে মোজাইক রোগের সৃষ্টি করে। **ক্যাপসিডের বাইরে এর কোনো আবরণ নেই। এটি একটি RNA ভাইরাস। PRSV এর দুটি প্রকরণের (PRSV-p এবং PRSV-w) মধ্যে PRSV-p দিয়ে পেঁপের রিংস্পট রোগ হয়।**

সংক্রমণঃ **জাব পোকা ও সাদা মাছি** (Melon Aphid- Aplus gossypii and Peach Aphid- Myzus persicaeদ্বারা পেঁপে গাছে রিংস্পট রোগের ভাইরাস সংক্রমিত হয়। কোনো আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে জাব পোকা খাদ্যগ্রহণ করলে ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে ভাইরাস পোকার দেহে চলে আসে এবং সাথে সাথে কোনো সুস্থ উদ্ভিদে বসলে উহা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। পোকার দেহে এ ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। যদি পেঁপে বাগানের গাছগুলো পোকার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে এবং বাগানে জাব পোকার সংখ্যা খুব বেশি থাকে তাহলে এ রোগ খুব দ্রুত ছড়ায় এবং ৪ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বাগান এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছ ছাঁটার সময় যান্ত্রিকভাবে এ রোগ বিস্তার ঘটতে পারে।

রোগের লক্ষণ : (i) উদ্ভিদ জন্মের সাথে সাথে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। সংক্রমণের ৩০-৪০ দিনের মধ্যে প্রথম রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(ii) ক্লোরোপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় হলদে-সবুজ মোজাইকের মতো দাগ পড়ে।

(iii) কাণ্ড, পাতার বোঁটা ও ফলে তৈলাক্ত বা পানি-সিক্ত গাঢ় সবুজ দাগ, স্পট বা রিং সৃষ্টি হয়।

(iv) অপেক্ষাকৃত কম বয়সের পাতায়ই রোগ লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়।

(v) আক্রমণ প্রকট হলে পাতায় বহুল পরিমাণে মোজাইক সৃষ্টি হয়, পাতা আকৃতিতে ছোট ও কুঁকড়ে যায়, গাছের মাথায় বিকৃত আকৃতির ক্ষুদ্রাকার কিছু পাতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য পাতা ঝরে পড়ে। কখনো কখনো পাতার কেবল শিরাগুলো থাকে।

(vii) পেঁপে হলুদ হয়ে যায়, রিংস্পট লক্ষণ প্রকাশিত হয়, আকার ছোট হয়ে যায়। অনেক সময় পুষ্ট হবার আগেই ঝরে যায়।

(viii) পেঁপের মিষ্টতা ও পেপেইন হ্রাস পায়।

(ix) ফলন শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

APARS

সূচীপত্রে ফেরত

(গ) পেঁপের রিংস্পট বা মোজাইক রোগ

প্রতিকার/নিয়ন্ত্রণ:

১। জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগাক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। জাল (net) দিয়ে পুরো জমি (পেঁপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড নামক পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে।

৩। এফিড নামক পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে (রগর বা রক্সিয়ন বা পারফেকথিয়ন 40 ইসি অথবা মেটাসিসটক্স 25 ইসি কীটনাশক 2 মিলিলিটার/লিটার পানিতে মিশিয়ে) করা যেতে পারে।

৪। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না।

৫। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম কর্তৃক জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কৃত নতুন জাতের ক্রস প্রোটেকশন করে আবাদ করলে রোগমুক্ত ফল উৎপাদন করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, ড, মাকসুদুল আলম আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পেঁপের জিনরহস্য উন্মোচন করেছেন। (এখন তিনি প্রয়াত ।)

APAR'S

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

১। যে এলাকাতে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সে এলাকায় পেঁপের চাষ বন্ধ করে দিতে হবে এবং দূরে নতুন এলাকায় রোগমুক্ত চারা দিয়ে চাষ শুরু করতে হবে।

২। ক্রস-প্রোটেকশন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত চারাগাছ থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। মৃদু প্রকৃতির PRSV জীবাণুকে প্রাণিদেহে ভাইরাল টিকাদানের মতো পোষক উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে গাছকে ভাইরাস প্রতিরোধী করা।

৩। PRSV সাধারণত বীজের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয় না, তবে প্রকটভাবে আক্রান্ত পেঁপের বীজ ব্যবহার করলে তা ইনোকুলামের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই ঐ ধরনের বীজ ব্যবহার না করা।

৪। ট্রান্সজেনিক জাত ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ। জিনগান পদ্ধতি ব্যবহার করে PRSV'S Coat protein জিনকে ভ্রূণ টিস্যুতে সংযুক্ত করে নতুন ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে ১৯৯৮ সালে। ট্রান্সজেনিক জাত দুটি হলো PRSV মুক্ত রেইনবো (Rainbow) ও সানআপ (Sunup)। এই ট্রান্সজেনিক জাত (GMO) PRSV দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

সূচীপত্রে ফেরত

ভাইরাস ও মানুষের ক্যান্সার

মানুষের প্রায় ৮৫% ক্যান্সার হয়ে থাকে জেনেটিক মিউটেশনের মাধ্যমে এবং প্রায় ১৫% ক্যান্সার হয়ে থাকে ভাইরাস দিয়ে; যেমন-

ক্যান্সার	সংযুক্ত ভাইরাস
১। লিভার ক্যান্সার	হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস
২। লিম্ফোমা : ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়েল ক্যান্সার	ইপস্টেইন-বার ভাইরাস
৩। টি-সেল লিউকেমিয়া	হিউম্যান টি-সেল লিউকেমিয়া ভাইরাস
৪। এনোজেনিটাল ক্যান্সার	প্যাপিলোমা (ওয়ার্ট) ভাইরাস
৫। ক্যাপোসি সার্কোসা	হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস

ব্যাকটেরিয়া

AFAR'S SINCE 2018

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria, একবচনে Bacterium)

গ্রিক শব্দ Bakterion = little rod থেকে ব্যাকটেরিয়া শব্দটির উৎপত্তি। ব্যাকটেরিয়া (একবচনে ব্যাকটেরিয়াম) এক ধরনের ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব। সর্ব প্রথম আণুবীক্ষণিক সমীক্ষায় আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য অ্যান্টনি ভ্যান লীউয়েনহুক কে **ব্যাকটেরিওলজি ও প্রোটোজুওলজির জনক** বলা হয়ে থাকে।

ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কারণে লুই পাস্তুরকে অনেকেই আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলতে চান।

মানুষের দেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে। মানুষের অন্ত্র ও ত্বকে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া থাকে

বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যাকটেরিয়ার গঠন, আবাস, রোগতত্ত্ব, বংশবিস্তার ইত্যাদি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয়। তাকে **ব্যাকটেরিওলজি** বলে।

ব্যাকটেরিয়া আদিকোষী (Prokaryotic) জীব। **এদের কোষে জড় কোষ প্রাচীর থাকে। তাই এরা উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন।**

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট আকারের জীব, এরা | আণুবীক্ষণিক (microscopic)।

২। এর এককোষী জীব, তবে একসাথে অনেকগুলো কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকতে পারে।

৩। ব্যাকটেরিয়া আদিকেন্দ্রিক (প্রাককেন্দ্রিক = Prokaryotic)।

৪। ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপ্রোটিন, সাথে মুরামিক অ্যাসিড (Muramic acid) এবং টিকোয়িক অ্যাসিড (Teichoic acid) থাকে।

৫। এদের বংশগতীয় উপাদান (genetic material) হলো একটি দ্বিসূত্রক, কার্যত বৃত্তাকার DNA অণু, যা - ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম হিসেবে পরিচিত।

৬। এদের বংশবৃদ্ধির প্রধান প্রক্রিয়া দ্বি-ভাজন (Binary fission)। ব্যাকটেরিয়ার দ্বি-ভাজন প্রক্রিয়ায় সাধারণত ৩০ মিনিট সময় লাগে।

৭। এদের কতক পরজীবী ও রোগ উৎপাদনকারী, অধিকাংশই মৃতজীবী এবং কিছু স্বনির্ভর (autophytic)।

৮। এরা সাধারণত বেসিক রং ধারণ করতে পারে (গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ)।

৯। ফায ভাইরাসের প্রতি এরা খুবই সংবেদনশীল।

১০। এদের অধিকাংশই অজৈব লবণ জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে।

১১। ব্যাক্টেরিয়া প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু গঠন করে। এ অবস্থায় এরা ৫০ বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। ।

১২। এরা -১৭ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাঁচে।

১৩। ক্রোমোসোম না থাকায় মাইটোসিস ও মায়োসিস ঘটে না।

১৪। এদের কতক বাধ্যতামূলক অবায়বীয় (obligate anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন থাকলে বাঁচতে পারে না। উদা- Clostridium কতক সুবিধাবাদী অবায়বীয় (facultative anaerobes) অর্থাৎ অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও বাঁচতে পারে। উদাহরন- *E. Coli* । কতক বাধ্যতামূলক বায়বীয় (obligate aerobes) অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না। উদা- Azotobacter beijerinckia।

APAR'S SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ (Clasifition Of Bacteria)

(ক) কোষের আকৃতিগত শ্রেণিবিভাগ

কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যথা- ১। কক্কাস, ২। ব্যাসিলাস,৩। কমাকৃতি, ৪। স্পাইরিলাম, ৫। বহুরূপি, ৬। স্টিলেট বা তারকাকার এবং ৭। বর্গাকৃতির।

১। কক্কাস: যে সব ব্যাকটেরিয়া কোষের আকৃতি প্রায় গোলাকার তাদেরকে কক্কাস বলে। কক্কাসকে আবার ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

(ক) মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস (Micrococcus) : যেসব ব্যাকটেরিয়া গোলাকার এবং একা একা থাকে তাদেরকে মাইক্রোকক্কাস বা মনোকক্কাস বলে; *icrococcus denitrificans.*

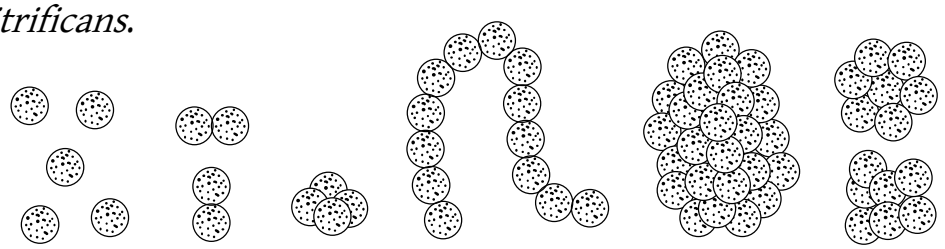

চিত্রঃ বিভিন্ন প্রকারে ব্যাকটেরিয়া (ক) মাইক্রোকক্কাস, (খ) ডিপোকক্কাস, (গ) টেট্রাকক্কাস, (ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস, (ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং (চ) সারসিনা।

APAR'S SINCE 2018

(খ) ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus; Diplo অর্থ double) দেখতে গোলাকার এবং এ ব্যাকটেরিয়াসমূহ জোড়ায় জোড়ায় থাকে; উদাহরণ- *Diplococcus pneumoniae.*

(গ) টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus) : যখন চারটি গোলাকার ব্যাকটেরিয়া একই তলে একত্রে বাস করে;উদাহরণ – *Gaffaya tetragena.*

(ঘ) স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus; Strepto অর্থ twisted chain) : এরাও দেখতে গোলাকার এবং চেইন (chain) বা মালার মতো সাজানো থাকে; উদাহরণ- *Streptococcus lactis.*

(ঙ) স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus; Staphylo অর্থ cluster): এগুলো গোলাকৃতি ব্যাকটেরিয়া এবং অনিয়মিত গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে, যা দেখতে অনেকটা আঙ্গুরের থোকার ন্যায় দেখায়; উদাহরণ- *Staphylococcus aureus.*

(চ) সারসিনা (Sarcina) : এগুলো দেখতে গোলাকার। কক্কাস জাতীয় ব্যাক্টেরিয়াগুলো একত্রে সমান সমান দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় একটি ঘনতলের মতো গঠন তৈরি করে তখন তাকে সারসিনা বলে; উদাহরণ- Sarcina lutea.

ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ (Clasifition Of Bacteria)

২। ব্যাসিলাস (Bacillus; L. bacillus অর্থ small rod, বহুবচনে ব্যাসিলি Pl. bacilli) দণ্ডাকৃতির ব্যাক্টেরিয়াকে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া বলে; উদাহরণ- Bacillus albus, Clostridium botulinum, Pseudomonas tabaci ইত্যাদি। ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া নিম্নলিখিত ধরনের—

- **মনোব্যাসিলাস** (Monobacillus) : যখন ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া এককভাবে থাকে তখন তাকে মনোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- Bacillus albus, Escherichia coli

- **ডিপ্লোব্যাসিলাস** (Diplobacillus) : দুটি ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত অবস্থায় থাকলে তাকে ডিপ্লোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ– Moraxella lacunata.

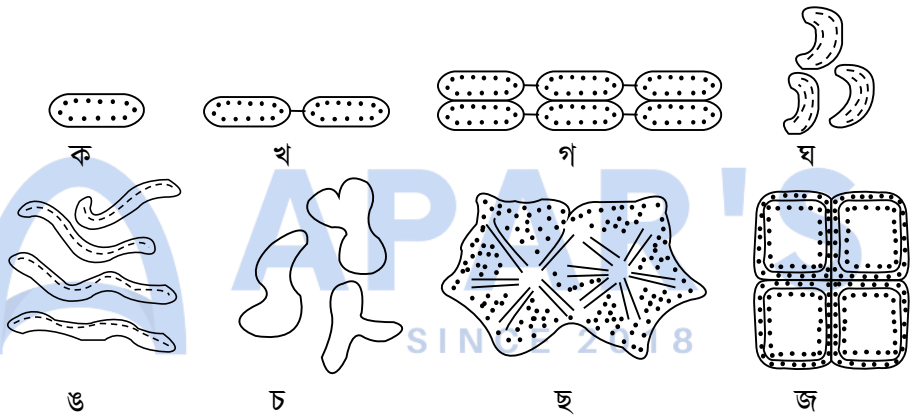

চিত্রঃ (ক) মনোব্যাসিলাস, (খ) ডিপোব্যাসিলাস, (গ) স্ট্রেপটোব্যাসিলাস, (ঘ) কমাকৃতি, (ঙ) স্পাইরিলাম, (চ) বহুরূপি, (ছ) তারকাকার এবং (জ) বর্গাকৃতির।

- **স্ট্রেপটোব্যাসিলাস** (Streptobacillus) : দুইয়ের অধিক ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া একত্রে যুক্ত হয়ে লম্বা সূত্রাকার গঠন তৈরি করে তখন তাকে স্ট্রেপটোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ- Streptobacillus moniliformiss.

- **কক্কোব্যাসিলাস** (Caccobacillus): যখন ব্যাকটেরিয়াগুলো সামান্য লম্বা বা কতকটা ডিম্বাকার হয় তখন তাকে কক্কোব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-Salmonella, Mycobacterium

- **প্যালিসেড ব্যাসিলাস** (Palisade bacillus) : কখনো কখনো ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো সমান্তরালভাবে অবস্থান করে অলীক টিস্যুর ন্যায় গঠন তৈরি করে তখন তাকে প্যালিসেড ব্যাসিলাস বলে; উদাহরণ-*Lampropedia sp.*

সূচীপত্রে ফেরত

৩। কমাকৃতি বা ভিব্রিও (Comma or Vibrio) : যেসব ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি সাধারণত কমা চিহ্নের ন্যায় তাদের কমা ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদাহরণ- *Vibrio cholerae*.

৪। স্পাইরিলাম (Spirillum; L-spirillum অর্থ a small coil or tuist, বহুবচনে স্পাইরিলা Pl spirilla বা: প্যাচানো বা সর্পিলাকার ব্যাকটেরিয়াকে স্পাইরিলাম বলে; উদাহরণ- *Spirillum minus.*

৫। বহুরূপি (Pleomorphic) : সুনির্দিষ্ট আকারবিহীন ব্যাকটেরিয়াকে বহুরূপি ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; উদা- *Rhizobium sp.*

৬। স্টিলেট বা তারকাকার (Stellate or Star shaped) : এরা দেখতে অনেকটা তারকার ন্যায়; যেমন-Stella sp.

৭। বর্গাকৃতির (Square shaped) : চার বাহুবিশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকেই বর্গাকৃতির ব্যাকটেরিয়া বলা হয়; যেমন- *Haloquadratum walsbyi.*

৮। ফিলামেন্টাস (Filamentus) : এদের গঠন যখন সূত্রাকার হয় তখন তাকে ফিলামেন্টাস বলে, যেমন *Candidatus savagella*

APAR'S SINCE 2018

(খ) রঞ্জনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :

ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, ক্লসট্রিডিয়াম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অ্যাকটিনোব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি গ্রাম positive। এনটেরোব্যাকটেরিয়া, সকল সায়ানোব্যাকটেরিয়া, শিগেলা, সালমোনেলা, রাইজোবিয়াম, ভিব্রিও, ই. কোলাই ইত্যাদি গ্রাম নেগেটিভ।

(গ) ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়)

১। **অ্যাট্রিকাস** (atrichous) :কোনো ফ্ল্যাজেলা থাকে না; উদাহরণ- *Corynebacterium diptheria*

২। **মনোট্রিকাস** (monotrichous) : কোষের এক প্রান্তে একটি মাত্র ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Vibrio cholerae.*

৩। **অ্যাম্ফিট্রিকাস** (amphitrichous) : কোষের দুইপ্রান্তে একটি করে ফ্ল্যাজেলাম থাকে; যেমন- *Spirillum minus*

৪। **সেফালোট্রিকাস** (cephalotrichous) : কোষের এক প্রান্তে একগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন-*Pseudomonas fluorescens*

৫। **লফোট্রিকাস** (lophotrichous) : কোষের দুই প্রান্তে দুইগুচ্ছ ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন-*Spirillum volutans*

৬। **পেরিট্রিকাস** (peritrichous) : দেহের সবদিকেই ফ্ল্যাজেলা থাকে; যেমন- *Salmonella typhi*

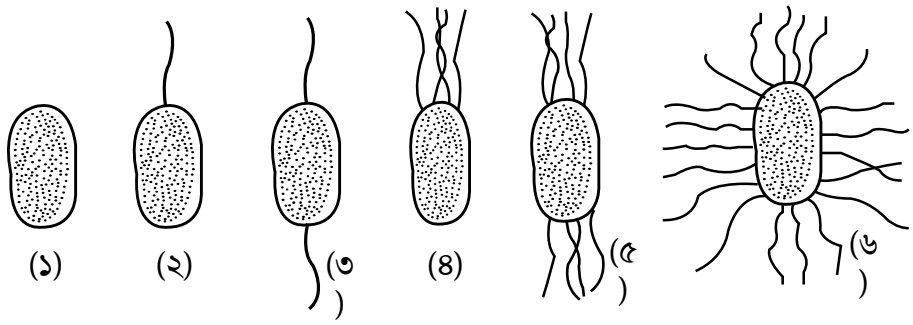

চিত্রঃ ফ্ল্যাজেলাভিত্তিক ব্যাকটেরিয়ার প্রকারভেদ : (১) অ্যাট্রিকাস (২) মনোট্রিকাস (৩) অ্যাম্ফিট্রিকাস (৪) সেফালোট্রিকাস (৫) লফোট্রিকাস (৬) পেরিট্রিকাস।

APAR'S SINCE 2018

ব্যাকটেরিয়ার গঠন

ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে, এদের কোষীয় গঠন বৈশিষ্ট্যেও তেমনই উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে একত্র করে একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়ামের গঠন হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

১। কোষ প্রাচীর :

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। কোষ প্রাচীরের.প্রধান উপাদান মিউকোপ্রোটিন জাতীয় যাকে **মিউরিন** বা **পেপটিডোগ্লাইকান**

২। ক্যাপসিউল :

বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কার্বোহাইড্রেট বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে **ক্যাপসিউল** বলে। একে স্লাইম স্তর বলা হয়। প্রতিকূল অবস্থা থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ।

৩। ফ্ল্যাজেলা :

ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে ফ্ল্যাজেলা গঠিত। প্রতিটি ফ্ল্যাজেলামের তিনটি অংশ থাকে। যথা- (i) সূত্র (ii) সংক্ষিপ্ত হুক এবং (iii) ব্যাসাল বডি।

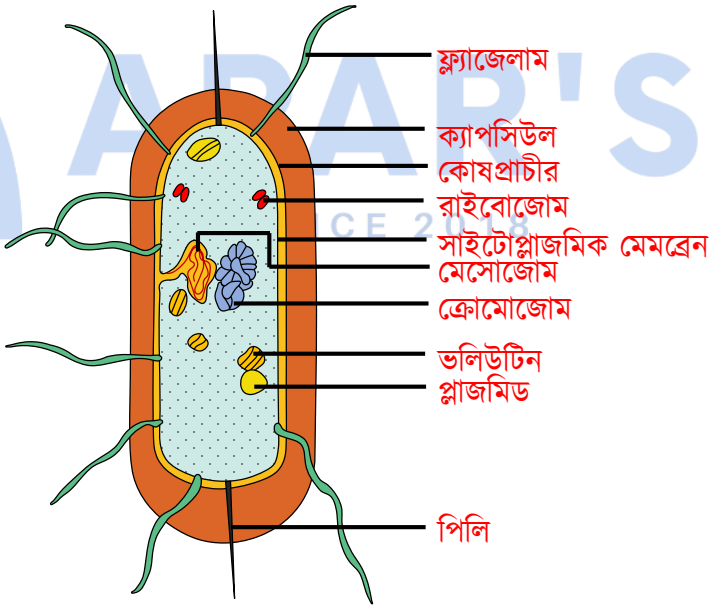

চিত্রঃ একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

৪। পিলি : কতগুলো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃঢ়, সংখ্যায় অধিক লোম সদৃশ অঙ্গ থাকে যাকে পিলি বলে। পিলি, **পিলিন** (Pilin) নামক এক প্রকার প্রোটিন দিয়ে তৈরি।। ।

৫। প্লাজমামেমব্রেন :

সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেমব্রেন অবস্থিত। এটি সরল শৃঙ্খলের ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হিসেবে অবস্থিত, এর সাথে মাঝে মাঝে প্রোটিন থাকে। এতে কোলেস্টেরল থাকে না।

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার গঠন

৬। মেসোসোম :

ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেমব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো গঠন সৃষ্টি করে যাকে মেসোসোম বলে।

৭। সাইটোপ্লাজম :

সাইটোপ্লাজমিক মেমব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ।

৮। ক্রোমোসোম :

কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে।

৯। প্লাসমিড :

বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকায় ও প্রকৃত বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, যাকে বলা হয় প্লাসমিড।

ABAR'S SINCE 2018

ফ্ল্যাজেলা ও পিলির মধ্যে পার্থক্য :

ভাইরাসের যেহেতু কোষ নেই, তাই এর দৈহিক বৃদ্ধি হয় না। ভাইরাসের গাঠনিক উপাদান গুলো তৈরি হয়। পরে সেসব একত্রিত হয়ে নতুন ভাইরাস তৈরি হয়।

ব্যাকটেরিওফাজ – এর সংখ্যাবৃদ্ধি দুইভাবে ঘটে থাকে। যথা-

১. লাইটিক চক্র

২. লাইসোজেনিক চক্র

ফ্লাজেলা	পিলি
১. কোষপ্রাচীরে ভেতরের পাদদেশীয় গ্র্যানিউল থেকে সৃষ্টি হয়।	১. কোষের সাইটোপ্লাজম থেকে সৃষ্টি হয়।
২. সূত্রাকার লম্বা অঙ্গবিশেষ।	২. খাটো, ফাঁপা, দণ্ডাকার, শক্ত অঙ্গবিশেষ।
৩. ফ্ল্যাজেলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।	৩. পিলিন নামক প্রোটিন দিয়ে তৈরি।
৪. ব্যাক্টেরিয়ার কোষে এদের সংখ্যা কম থাকে।	৪. এদের সংখ্যা বেশি থাকে।
৫. ফ্লাজেলা চলনে সাহায্য করে।	৫. পিলি পোষকদেহে সংযুক্তিতে সহায়তা করে।

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার জনন

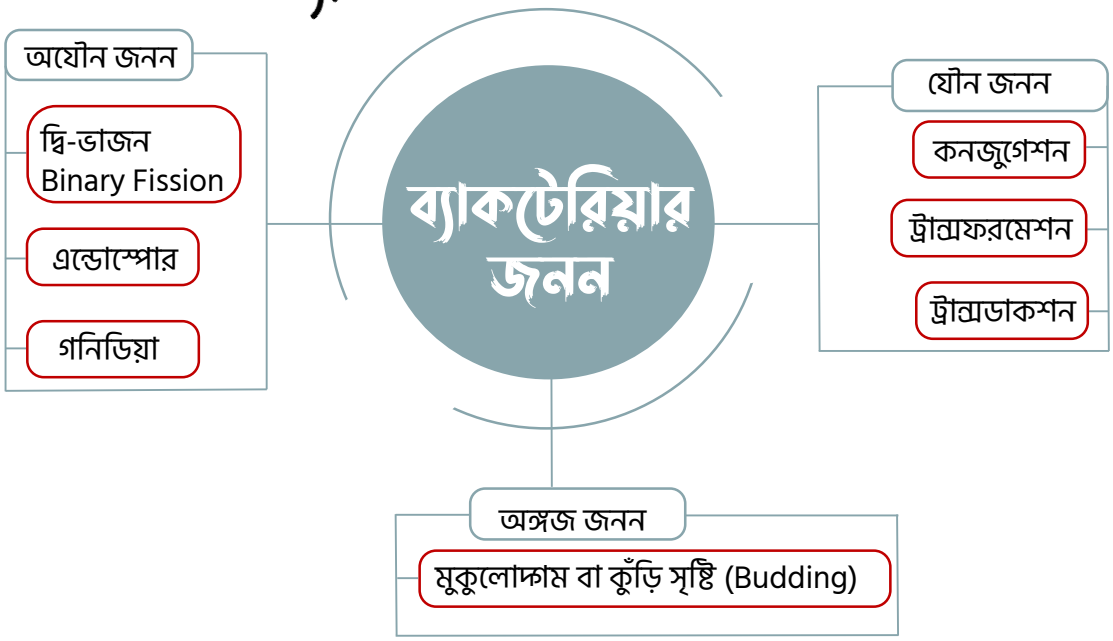

বর্ণনা :

ব্যাকটেরিয়ার জনন (Reproduction of Bacteria)

ব্যাকটেরিয়ার প্রধান জনন পদ্ধতি হলো দ্বি-ভাজন, এটি একটি অযৌন পদ্ধতি।

APAR'S SINCE 2018

দ্বি-ভাজন (Binary fission) :

একটি কোষ সমান দুই ভাগে ভাগ হওয়ার নাম দ্বি-ভাজন। অন্যভাবে বলা যায় দ্বি-ভাজন হলো আদি কোষের অযৌন জনন প্রক্রিয়া যেখানে নিউক্লিয়ার বস্তু (DNA) সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। **দ্বি-ভাজন পদ্ধতিই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি তথা প্রজননের প্রধান উপায়।**

মুকুলোদ্গম (Budding) :

অযৌন জনন (Asexual reproduction) :

প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া গনিডিয়া বা এন্ডোস্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজনন সম্পন্ন করে। এই পদ্ধতিকে অযৌন জনন পদ্ধতি বলা হয়।

i) গনিডিয়া : Leucothris জাতীয় সূত্রাকার ব্যাকটেরিয়ার অগ্রভাগ হতে গনিডিয়া নামক অযৌন একক সৃষ্টি হয় যা একসময় পৃথক হয়ে যায় এবং অনুকূল পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকটেরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ii) এন্ডোস্পোর বা অন্তরেণু উৎপাদন :

সাধারণত Bacillaceae গোত্রের ব্যাকটেরিয়া অন্তরেণু উৎপন্ন করে থাকে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম হতে একটি অন্তরেণু উৎপন্ন হয় তাই এর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটে না, প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মাত্র। এটি প্রকৃতপক্ষে জনন প্রক্রিয়া নয়।

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার জনন

যৌন জনন (Sexual reproduction) :

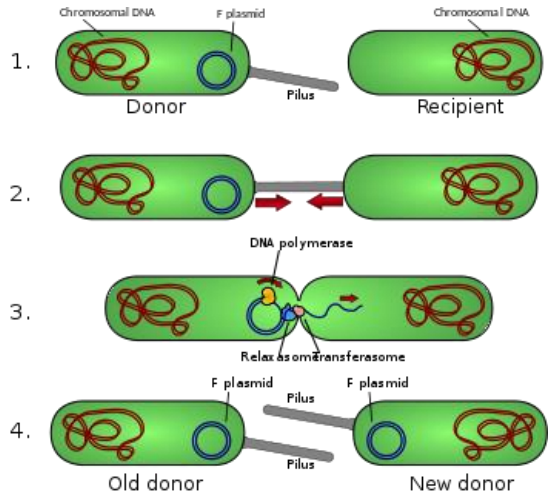

i) কনজুগেশন নালিপথে :

ii) পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার (সাধারণত মৃত ব্যাকটেরিয়ার) DNA গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটতে পারে। একে বলে **ট্রান্সফরমেশন** (Transformation)।

APAR'S
SINCE 2018

iii) ফায ভাইরাসের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়ার জিনোম, কখনও ফায জিনোম, অন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটাতে পারে। একে বলে **ট্রান্সডাকশন** (Transduction)।

BACTERIA:
THE ONLY
CULTURE SOME
PEOPLE HAVE.

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

অপকারিতা

রোগসৃষ্টি

খাদ্যদ্রব্যের পচন ও বিষাক্তকরণ :

পানি দূষণ :

মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্টকরণ :

নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষতি সাধন :

বায়োটেরোরিজম/জৈব সন্ত্রাস :

যানবাহনের দুর্ঘটনা :

উপকারিতা

APAR'S
SINCE 2018

ক) চিকিৎসা ক্ষেত্রে :

১। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে :

২। প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে :

৫। নাইট্রিফিকেশন : $[NH_3 \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-]$

৬। পতঙ্গনাশক হিসেবে :

৭। পশু খাদ্য বা সিলেজ তৈরি :

(গ) শিল্প ক্ষেত্রে :

৮। ফলন বৃদ্ধিতে :

৯। চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে :

১০। দুগ্ধজাত শিল্পে :

১১। পাট শিল্পে :

১২। চামড়া শিল্পে :

১৩। বায়োগ্যাস বা জৈব গ্যাস তৈরিতে :

১৪। টেস্টিংসল্ট প্রস্তুতিতে :

১৫। রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকরণে

সূচীপত্রে ফেরত

ব্যাকটেরিয়ার উপকারিতা ও অপকারিতা

উপকারিতা

(ঘ) মানব জীবনে :

১৬। সেলুলোজ হজমে

১৭। ভিটামিন তৈরিতে

১৮। জিন প্রকৌশলে

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়নে :

১৯। আবর্জনা পচনে

২০। পয়ঃনিষ্কাশনে

২১। তেল অপসারণে

২২। বায়োগ্যাস উৎপাদন : Bacillus, E. coli, Clostridium, Methanococcus।

ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট কতিপয় রোগ, কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

APAR'S
SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

ক. ধান গাছের ব্লাইট রোগ (Blight Disease of rice)

ধানের মারাত্মক রোগগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট অন্যতম। প্রায় পৃথিবীব্যাপীই এর বিস্তৃতি। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণটি (strain) শীতপ্রধান অঞ্চলের প্রকরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক।

রোগজীবাণু (Pathogen/Causal organism) :

ধান গাছের ব্যাকটেরিয়্যাল ব্লাইট নামক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যকটেরিয়ার নাম Xanthomonas oryzae pv. oryzae Ishsyama Swings et al.

রোগাক্রমণ (Infection) :

একাধিক উৎস থেকে রোগাক্রমণ ঘটতে পারে, যেমন- রোগাক্রান্ত বীজ, রোগাক্রান্ত খড়, জমিতে পড়ে থাকা রোগাক্রান্ত শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি।

রোগ লক্ষণ (Sign and Symptoms) :

১। সাধারণত আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়।

২। পাতায় ভেজা (Water-soaked), অর্ধস্বচ্ছ ও লম্বা লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাগ পাতার শীর্ষে শুরু হয়।

৩। দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা ধূসর বর্ণের হয়।

৪। সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।

৫। আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মরে যায়।

৬। লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে চারা ঢলে পড়ে।

৭। ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

৮। আক্রান্ত গাছের অধিকাংশ ধান চিটায় পরিণত হয়।

APAR'S SINCE 2015

সূচীপত্রে ফেরত

ক. ধান গাছের ব্লাইট রোগ (Blight Disease of rice)

রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ :

১। সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক্ষম প্রকরণ চাষ করা ।

২। বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্লিচিং পাউডার (১০০ mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (২%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।

৩। কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।

৪। জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে ।

৫। নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

৬। গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ২ কেজি ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

৭। ফিনাইল সারফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।

৮। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

APAR'S
SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

খ. কলেরা (Cholerae)

রোগজীবাণু : Vibrio cholerae নামক ব্যাকটেরিয়া। এ ব্যাকটেরিয়ার আকৃতি একটু বাঁকা, কমার মতো। কলেরা রোগের জীবাণু দেহে ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাসের সাথে লেগে যায় এবং কলেরাজেন (Choleragen) নামক টক্সিন মিশ্রিত করে। **কলেরাজেন একটি এন্টারোটক্সিন।**

রোগ লক্ষণ : কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ হলো প্রবল উদরাময় (ডায়রিয়া)। পায়খানার প্রথম দিকে মল থাকে, পরে চালধোয়া পানির মতো নির্গত হয়। রোগীর দেহে জ্বর থাকে এবং বমি হতে পারে। নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ হয়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রক্ত প্রবাহ কমে মস্তিষ্কে O_2 এর ঘাটতি দেখা দেয় ও রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। দেহে মাংসপেশীর সংকোচন (cramp) এ রোগের একটি প্রধান লক্ষণ বমি এবং ঘন ঘন পানির ন্যায় পায়খানার ফলে রোগীর দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে, একই কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগীর প্রচণ্ড পিপাসা, খিচুনি দেখা দেয়, রক্তচাপ কমে যায়, দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রোগের প্রচণ্ডতায় রোগীর চোখ বসে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়ে যায়। চামড়া কুঁচকে যায়। ব্যাপক পরিমাণে শরীর থেকে পানি ও ইলেকট্রোলাইট হারানোর ফলে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রোগী মারা যেতে পারে। এছাড়া রক্ত সংবহনতন্ত্র অচল হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

প্রতিকার : কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, তাই পানি ও লবণ সমন্বয়ের জন্য শিরায় সেলাইন দেয়া হলো উত্তম চিকিৎসা। সাথে ডাবের পানি ও খাবার সেলাইন-ORS (Oral Rehydration Saline) দেয়া যেতে পারে। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে। মোট কথা রোগীর দেহে যেন পানিশূন্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ : কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ, তাই বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা করতে হবে। দূষিত পানি, বাসি খাবার, রাস্তার উন্মুক্ত খাবার ও পানীয় বর্জন করতে হবে। রোগীর ভেদ-বমি থেকে মাছির সাহায্যে গৌণ সংক্রমণ ঘটে, তাই খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। রোগীর পরিধেয় কাপড়, বিছানা-পত্র পুকুর বা নদী নালায় না ধুয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকাতে হবে। সম্ভব হলে রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। কোনো এলাকায় কলেরা দেখা দিলে সবার কলেরা ভেকসিন (টিকা) নিতে হবে। কলেরা রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ডাবের পানি ও কলেরা সেলাইন খাওয়াতে হবে যাতে পানি ও ইলেক্ট্রোলাইটের ঘাটতি দ্রুত পূরণ হয়।

APAR'S

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া পরজীবী

ম্যালেরিয়া পরজীবীর শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান :

Kingdom: Protista

Subkingdom: Protozoa

Phylum: Apicomplexa

Class: Sporozoa

Order: Haemosporidia

Family: Plasmodiidae

Genus: Plasmodium

Species: Plasmodium vivax, P. ovale, P. falciparum, P. malariae

সাধারণত ৪ ধরনের পরজীবী এর আক্রমণে ম্যালেরিয়া হয়।

APAR'S

ম্যালেরিয়ার পরজীবীর নাম	রোগের নাম	জ্বরের প্রকৃতি
১. *Plasmodium vivax*	বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে
২. *Plasmodium malariae*	কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া	72 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে
৩. *Plasmodium ovale*	মৃদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে
৪. *Plasmodium falciparum*	ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া	36-48 ঘন্টা পর পর জ্বর আসে

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া পরজীবী

জীবন চক্র (Life Cycle)

কোন জীব তার অনুরূপ সৃষ্টি করতে যে সকল ধাপসমূহ অতিক্রম করে, তাদের সমষ্টিকে জীবন চক্র বলে।

Plasmodium vivax এর জীবন চক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়, যথা-মানুষ ও মশকী।

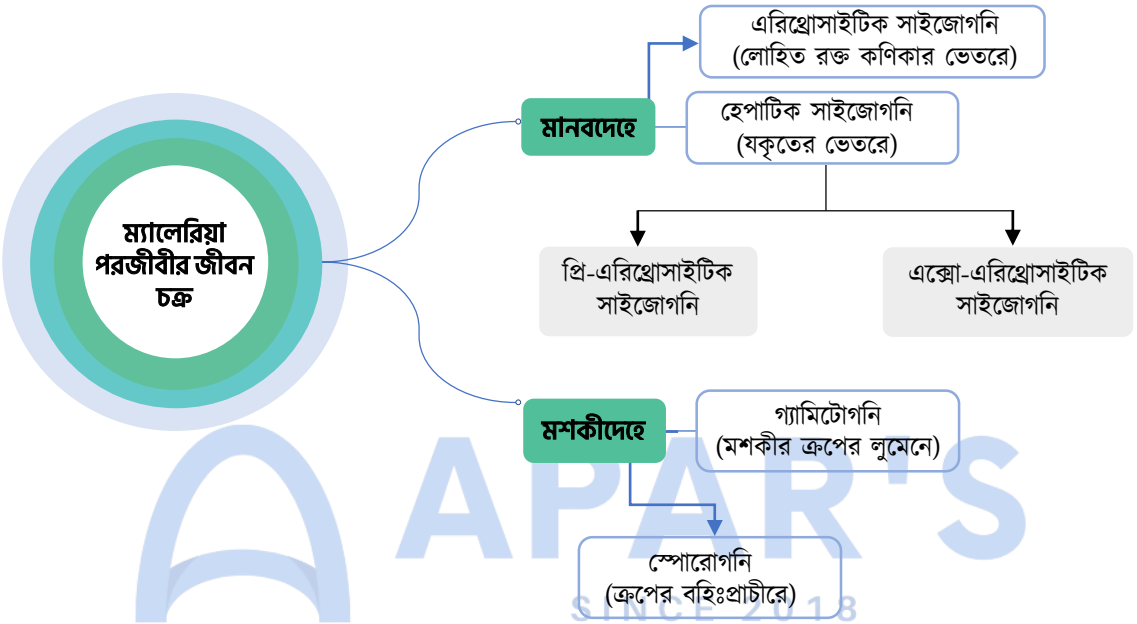

APAR'S SINCE 2013

সূচীপত্রে ফেরত

মানবদেহে জীবন চক্র

মানুষের যকৃত ও লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়ার পরজীবীর অযৌন জনন পদ্ধতিতে জীবন চক্র সম্পন্ন করে। এ জীবন চক্রে সাইজন্ট নামক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট একটি বিশেষ দশা বিদ্যমান থাকে। এ ধরনের জীবন চক্রকে সাইজোগনি বলে। মানবদেহে সংঘটিত সাইজোগনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। হেপাটিক সাইজোগনি বা যকৃত সাইজোগনি এবং ২। এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্তকণিকা সাইজোগনি।

১। হেপাটিক সাইজোগনি (Hepatic Schizogony) : মানুষের যকৃত কোষে সংঘটিত ম্যালেরিয়ার পরজীবীর বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন জননকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে।

(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Pre-erythrocytic Schizogony) : মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে (হেপাটোসাইটে) স্পোরোজয়েট থেকে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনিকে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। এ সময় একেকটি সাইজন্ট থেকে ৮০০০ – ২০০০০ মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়।

(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি (Exo-erythrocytic Schizogony) : মানুষের যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট থেকে মাইক্রো ও ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট সৃষ্টি পর্যন্ত পরজীবীর সাইজোগনিকে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে।

APAR'S
SINCE 2018

(ক) প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি :

১। স্পোরোজয়েট-এর যকৃত কোষে প্রবেশ :

২। ক্রিপ্টোজয়েট :

৩। সাইজন্ট

৪। ক্রিপ্টোমেরোজয়েট

ম্যালেরিয়া পরজীবীর হেপাটিক সাইজোগনি চক্র

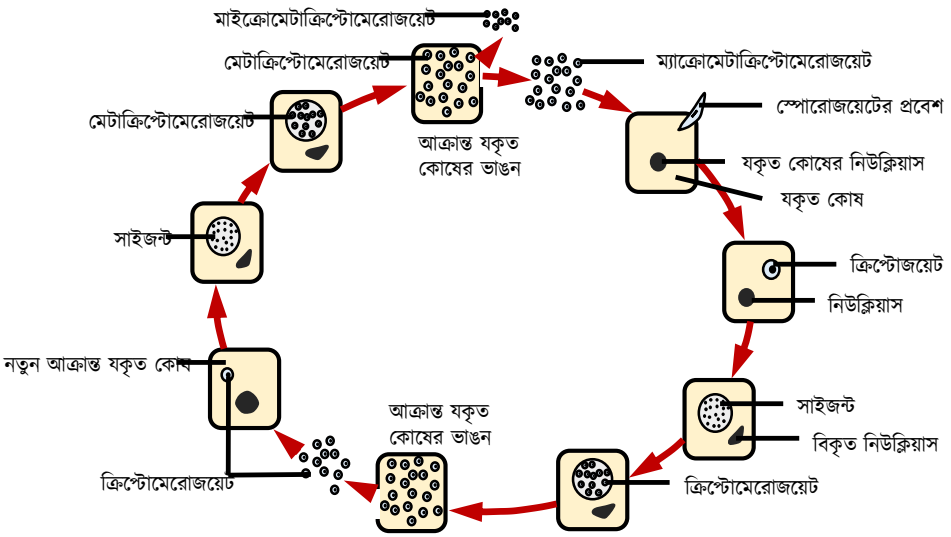

সূচীপত্রে ফেরত

মানবদেহে জীবন চক্র

(খ) এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগিনি : এ চক্রের ধাপগুলো নিম্নরূপ :

১। প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন কিন্টোমেরোজয়েটও নতুন হেপাটোসাইটকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রের সূচনা করে।

২। সাইজন্ট

৩। মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট

৪। আক্রান্ত যকৃত কোষের ভাঙ্গন : মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো পরিণত হলে আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসে এবং নতুন নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এ চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। এ অবস্থায় মানুষের যকৃতে প্রচুর মেরোজয়েট পাওয়া যায়। আকারের ভিত্তিতে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— **(ক) মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও (খ) ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট।**

মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো আকারে ছোটো এবং ম্যাক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েটগুলো আকারে বড়ো হয়।

২। এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত রক্তকণিকায় সংঘটিত সাইজোগনি : হেপাটিক বা যকৃত সাইজোগনিতে সৃষ্ট মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করার পর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রের শুরু হয়।

১। ট্রোফোজয়েট (Trophozoite) : অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা।

২। সিগনেট রিং (Signet ring) : এ অবস্থায় পরজীবীটিকে একটি পাথর বসানো আংটির মতো মনে হয়। এ অবস্থাকে সিগনেট রিং বলে।

৩। আমিবয়েড ট্রাফোজয়েট (Amoeboid trophozoite) : প্রায় ৮ ঘণ্টার মধ্যে পরজীবীর অন্তঃস্থ গহ্বরটি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পরজীবীটি ক্ষণপদবিশিষ্ট অ্যামিবার আকৃতি ধারণ করে। তাই একে অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েট বলে।

৪। সাইজন্ট (Schizont) : বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট পরজীবীকে সাইজন্ট বলে।

AARS SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

মানবদেহে জীবন চক্র

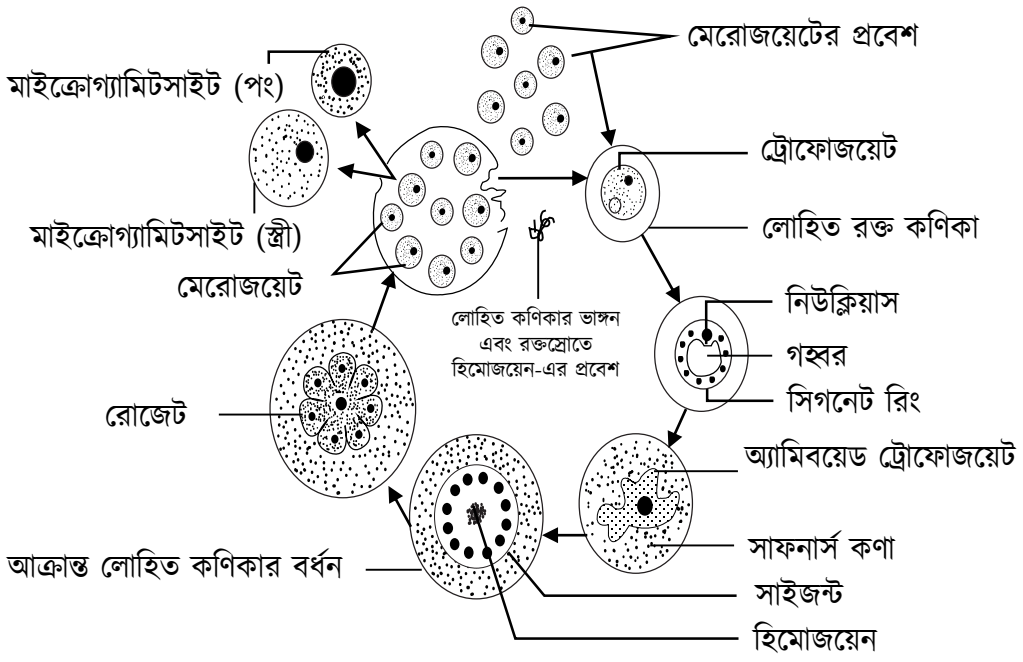

চিত্র ৪.১৮ : এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি।

APAR'S SINCE 2018

৫। মেরোজয়েট (Merozoite) : সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস প্রায় 45 ঘণ্টা পর সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেমব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে ১২-১৮টি গোলাকার কোষে পরিণত হয়। এদেরকে মেরোজয়েট বলে।

৬। গ্যামিটোসাইট গঠন (Formation of Gametocyte) : এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চক্রে উৎপন্ন কিছুসংখ্যক মেরোজয়েট, ট্রোফোজয়েট এবং সাইজন্টে পরিণত না হয়ে লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হয়ে গ্যামিটোসাইট গঠন করে। গ্যামিটোসাইট দু'প্রকার; যথা-

(ক) পুংগ্যামিটোসাইট : এরা ৯-১০ μm ব্যাসবিশিষ্ট, সাইটোপ্লাজম হালকা নীল বর্ণের হয়।

(খ) গ্যামিটোসাইট : এরা ১০-১২ μm ব্যাসবিশিষ্ট, সাইটোপ্লাজম ঘন নীল বর্ণের হয়। নিউক্লিয়াস ছোটো, প্রান্তভাগে অবস্থিত।

সূচীপত্রে ফেরত

মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র

গ্যামিটোগনি (Gametogony)

মশকীর ক্রপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন জননকে গ্যামিটোগনি বলে।

১। গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস (Gametogenesis):

গ্যামিটোজেনেসিস দু'প্রকার। যথা-

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস

এবং

(খ) উওজেনেসিস।

(ক) স্পার্মাটোজেনেসিস :

(Spermatogenesis-sperm=শুক্রাণু, gen=গঠন, sis= পদ্ধতি)

মাইক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণু বা পুংজনন কোষ গঠন প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে। যথা :

(i) প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে ৪ – ৮টি ক্ষুদ্রাকার হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণা (৪ - ৮টা) বিশিষ্ট হয়।

(ii) প্রতিটি কোণার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এদেরকে সাইটোপ্লাজমীয় অভিক্ষেপ বলে।

(iii) এর পরপরই জীবাণুর দেহটি কতগুলো ফ্ল্যাজেলা আকৃতির সরু মাকুর মতো মাইক্রোগ্যামিটে বা শুক্রাণুতে পরিণত হয়। [ক্রপের গহ্বরে তাপের তারতম্যের দরুন এই প্রক্রিয়া ঘটে] ক্রপে গহ্বরে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পার্মাটোজেনেসিসের এ বিশেষ প্রক্রিয়াকে **এক্সফ্ল্যাজেলেশন** (Exflagellation) বলে ।

(iv) মাইক্রোগ্যামিটগুলো প্রথমে একসাথে থাকে, পরে এরা মাতৃকোষ থেকে এক্সফ্ল্যাজেলেশন প্রক্রিয়ায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সাঁতার কাটতে থাকে ।

APA'S SINCE 2018

মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন চক্র

(খ) উওজেনেসিস (Oogenesis -Oo = ডিম্বাণু, gen = গঠন, sis = পদ্ধতি) :

ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে ম্যাক্রোগ্যামিট বা ডিম্বাণু বা স্ত্রীজননকোষ গঠন প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে। এ প্রক্রিয়া কয়েকটি উপধাপে ঘটে।

(i) প্রথমে প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট-এর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয় ও একটি করে সক্রিয় গোলাকার ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। এ ছাড়া পোলার বডি নামক আর একটি কোষের আবির্ভাব ঘটলেও শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) এর পরপরই ম্যাক্রোগ্যামিটের একপ্রান্ত কিছুটা উঁচু হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলকে নিষেক শঙ্কু/কোন (Fertilization) বা অভ্যর্থনা শঙ্কু (Reception cone) বলে। ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস এ শঙ্কুর কাছে অবস্থান করে।

২। নিষেক ও জাইগোট গঠন (Fertilization and the formation of zygote)

৩। উওকিনেট গঠন : মশকী রক্ত শোষণের ১২-১৪ ঘণ্টা পর গোল ও নিশ্চল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেট-এ পরিণত হয়।

৪. উওসিস্ট : একটি মশকীর ক্রপে ৫০-৫০০টি পর্যন্ত উওসিস্ট দেখা যায়। উওসিস্ট পরিণত হতে ১০-২০ দিন সময় লাগে।

ABAB'S SINCE 2018

স্পোরোগনি (Sporogony)

মশকীর ক্রপের দুই স্তরের মাঝে সংলগ্ন থাকা অবস্থায় উওসিস্ট দশার জীবাণু যে জননের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট দশার জীবাণু সৃষ্টি করে তাকে স্পোরোগনি বলে।

১। উওসিস্টের নিউক্লিয়াস বিভাজন :

উওসিস্টের মায়োসিসকে **পোস্ট জাইগোটিক মায়োসিস** (Post zygotic meiosis) বলে । পরিণত উওসিস্টের আকার প্রথম অবস্থা থেকে ৪-৫ গুণ বড় হয়। উত্তসিস্ট পরিণত হতে প্রায় ১০-২০ দিন সময় লাগে।

২। পরিস্ফুটিত উওসিস্ট :

৩। স্পোরোজয়েট গঠন :

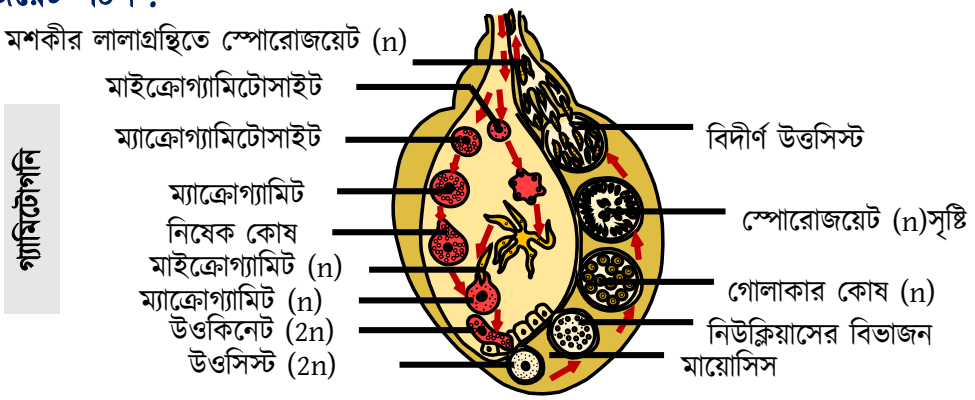

মশকীর দেহে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন চক্র ।

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া জীবাণূর জীবন চক্রে জনক্রম ব্যাখ্যা

কোনো জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে জনুক্রম (alternation of generation) বলে।

হ্যাপ্লয়েড (n) দশা

স্পোরোজয়েট দশা (n)

মাইক্রো-মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট (n)

ডিপ্লয়েড (2n) দশা

জাইগোট দশা (2n) : স্ত্রী ও পুং গ্যামিটের মিলনের ফলে জাইগোট (2n) সৃষ্টি হয়।

উওকিনেট (2n) :

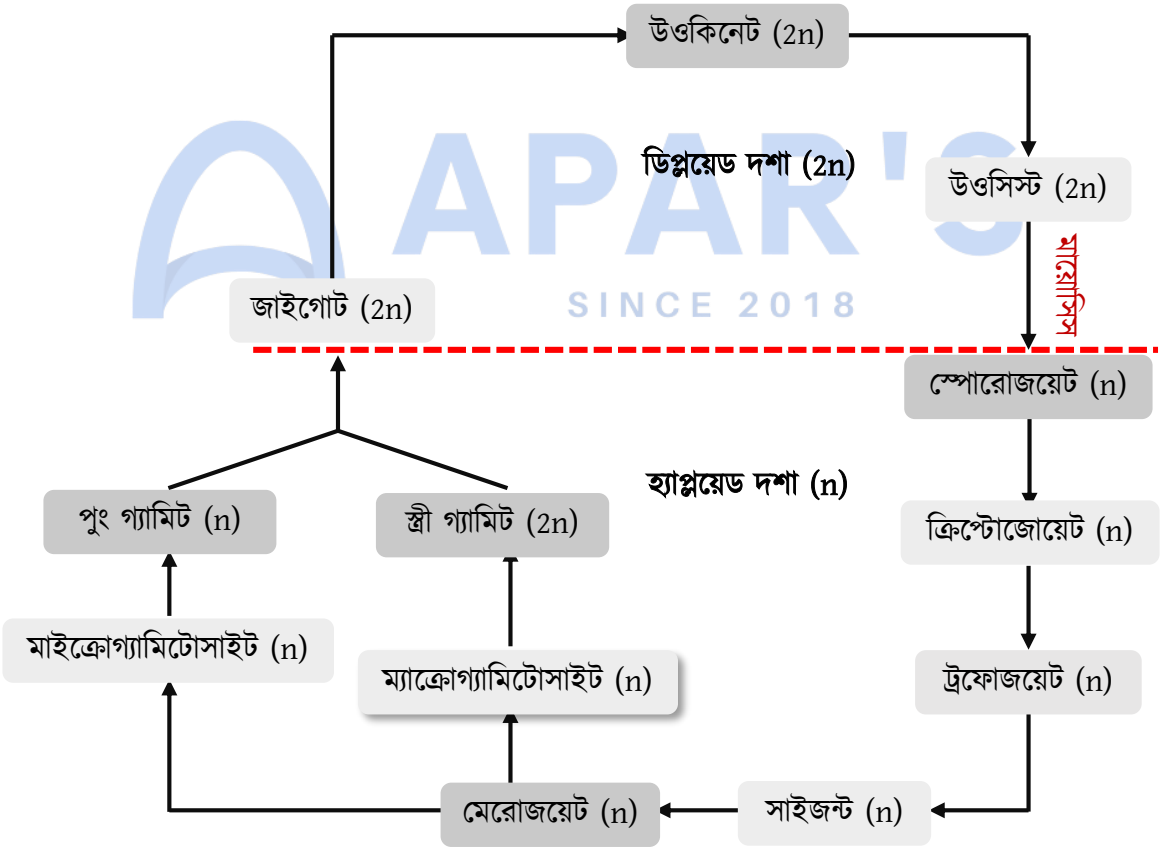

APAR'S SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া জীবাণূর জীবন চক্রে জনক্রম ব্যাখ্যা

জনুক্রমের তাৎপর্য (Significance of Alternation of Generation)

১। জনুক্রমে জীবাণুর প্রজাতির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখে।

২। জনুক্রম জীবাণুর জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনে।

৩। জনুক্রম জীবাণুর বিস্তৃতিতে সহায়তা করে।

৪। জনুক্রম জীবাণুর জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে।

৫। জনুক্রম প্রজাতিতে বৈচিত্র্য আনে ফলে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর সুপ্তাবস্থাকাল বা সুপ্তিকাল (Incubation period)

ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করার সময় থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কে ম্যালেরিয়া রোগের সুপ্তাবস্থাকাল (Latent period or Incubation period) বা সুপ্তিকাল বলে।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিভিন্ন প্রজাতির সুপ্তাবস্থার সময়কাল :

(i) Plasmodium vivax ১২-২০ দিন

(ii) Plasmodium falciparum ৮-১৫ দিন

(iii) Plasmodium ovale ১১-১৬ দিন

(iv) Plasmodium malariae ১৮-৪০ দিন

APAR'S
SINCE 2018

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ :

১। প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধরা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অদ্রিা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।জ্বর ১০৫-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জ্বর কমে যায়। **৪৮ ঘণ্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসাই Plasmodium. vivax জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ।**

৩। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দ্রুত রক্তের লোহিত কণিকা ভাঙতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, প্লীহা, যকৃত ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া সংক্রমণ (Transmission of Malaria)

স্ত্রী Anopheles মশকীই ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটানোর একমাত্র মাধ্যম। পৃথিবীতে প্রায় দু'শত প্রজাতির Anopheles মশকী থাকলেও মূলত: ৬টি প্রজাতিই এ রোগের ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটায় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাজাতিগুলো হলো- Anopheles culicifacies, A. stephensi, A. fluviatilis, A. dirus, A. sundaicus, A. minimus।

মানবদেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশের পর বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে একসময় গ্যামিটোসাইট গঠন করে। *Plasmodium vivax* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো মানুষের রক্তে ৭ দিন, কিন্তু *Plasmodium falciparum* হতে সৃষ্ট গ্যামিটোসাইটগুলো ৩০- ৬০ দিন, এমনকি ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যে রোগীর দেহ হতে এরা মশকীর দেহে প্রবেশের সুযোগ পেলে পরবর্তী চক্র সম্পন্ন করতে শুরু করে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (Prevention & Control of Malaria

(ক) মশক নিধন,

(খ) মশকী হতে আত্মরক্ষা এবং

(গ) চিকিৎসা।

APAR'S
SINCE 2018

(ক) মশকী নিধন :

(i) প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস

(ii) লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা : পানিতে **জুভেনাইল হরমোন** ছিটিয়ে দিলে, লার্ভাগুলোর রূপান্তর ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশককুল নিধন : ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব।

(iv) অধিকাংশ শহর এলাকাতে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক ব্যবহার করা হয়

(খ) মশকীর দংশনের হাত হতে আত্মরক্ষা

(গ) ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা (Treatment) :

বি. দ্র. সুস্থদেহে সিনকোণা রস কম্পজ্বর সৃষ্টি করে। কম্প জ্বরে (ম্যালেরিয়া) সিনকোণা রস সেবনে রোগ আরোগ্য হয়। এ থেকে হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে।

ম্যালেরিয়ার টিকা (Malarial Vaccine) : দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTS,S নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA) ইতিমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সূচীপত্রে ফেরত

একো-এরিথ্রোসাইটিক (হেপাটিক) এবং এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	হেপাটিক সাইজোগনি	এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি
১. কোথায় ঘটে	মানুষের যকৃতে সংগঠিত হয়।	মানুষের লোহিত কণিকায় ঘটে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	ক্রিপ্টোজয়েট, ক্রিপ্টোমেরোজয়েট ও মেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েট নামক ধাপসমূহ পাওয়া যায়।	ট্রাফোজয়েট, সিগনেট রিং, সাইজন্ট ও মেরোজয়েট ধাপসমূহ দেখা যায়।
৩. হিমোজয়েন	উৎপন্ন হয় না।	শেষের দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।
৪. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	এ চক্র চলাকালে মানুষের জ্বর হয় না।	এ চক্র চলাকালে মানবদেহে কাঁপুনিসহ জ্বর হয়।
৫. সাফনার-এর দানা	দেখা যায় না।	সাইজন্টের বাইরে সাফনার- এর দানা পাওয়া যায়।
৬. জ্বর	জ্বর হয় না।	এ চক্র চলাকালে মানবদেহে কাঁপুনিসহ জ্বর হয়।

SINCE 2018

সূচীপত্রে ফেরত

ম্যালেরিয়া পরজীবী অযৌন ও যৌন চক্রের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অযৌন চক্র (সাইজোগনি)	যৌন চক্র (স্পোরো গনি)
১. কোথায় ঘটে	মানুষের যকৃত ও লোহিত কণিকায়।	মশকীর ক্রপের মধ্যে এবং হিমোসিলে।
২. মধ্যবর্তী ধাপসমূহ	মেরো জয়েট, ট্রফোজয়েট, সাইজন্ট, সিগনেট রিং ও রো জেট এ চক্রের মধ্যবর্তী ধাপ।	এ চক্রে গ্যামিট, জাইগোট, উওকিনেট, উওসিস্ট ও স্পোরো জয়েট দেখা যায়।
৩. সর্বশেষ ধাপ	গ্যামিটোসাইট।	স্পোরো জয়েট।
৪. হিমোজয়েন	এ চক্রের শেষের দিকে হিমোজয়েন সৃষ্টি হয়।	কখনোই হিমোজয়েন সৃষ্টি হয় না।
৪. পোষকদেহে প্রতিক্রিয়া	কাঁপুনিসহ জ্বর, সে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গ।	তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।
৬. চক্রের পুনরাবৃত্তি	ঘটে।	ঘটে না।
৭. গ্যামিট	সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্টি হয়।
৮. জাইগোট	যেহেতু গ্যামিট সৃষ্টি হয় না তাই জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।	পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ঘটিয়ে জাইগোট সৃষ্টি করে।

সূচীপত্রে ফেরত